বিমূর্ত শিল্পের উৎস ও উত্তরাধিকার

ইমতিয়ার শামীম

সমালোক ঃ এই ছবির আইডিয়া কী?
রবীন্দ্রনাথ ঃ কোনও আইডিয়া নেই। এটি একটি ছবি। আইডিয়া থাকে কথায়, জীবনে নয়।
সমালোচক ঃ আপনার ছবির কোনো নাম আছে কি?
রবীন্দ্রনাথ ঃ কোনও নাম নেই। কোনও নামের কথা ভাবতেও পারি না। এদের কীভাবে বর্ণনা করবো জানি না।১

বিমূর্ত শিল্প নিয়ে বাঙালি শিল্পীরা চিন্তাভাবনা শু করেছিলেন কত আগে? এর কোনো নির্দিষ্ট পর্বক্ষণ আমরা বলতে পারব না। তবে ১৯৩০ - এর সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রদর্শনী শুর আগে শিল্পসমালোচক আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যেকার এই কথোপকথনকে বাঙালি চিত্রশিল্পীদের বিমূর্ত শিল্পসংক্রান্ত চিন্তাভাবনার শু বিন্দু হিসেবে উল্লেখ করলে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না। ছবির আইডিয়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা ছিল তখনকার শিল্পচিন্তা থেকে একেবারেই অন্যরকম, বিগত মহাযুদ্ধ ও আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দোলাচলে তাঁর নিজের সামগ্রিক চিন্তাজগতে সংগঘটিত পরিবর্তনেরই এক শৈল্পিক প্রতিফলন ঘটে এর মধ্যে। এই দোলাচল তাঁরসাহিত্য এবং শিল্পকলার প্রকাশভঙ্গিমা ও অন্তিবস্তুকে দুটি ভিন্ন পথে নিয়ে যায়, যা আর কখনো এক হয়নি। রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার এই পর্বকে বিবেচনায় নিলে, তার সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ আর রামকিঙ্করকে যোগ করলে ঝিজনীন বিমূর্ত শিল্পচিন্তার সঙ্গে বাঙালি বিমূর্তমানসের দূরত্ব খুব বেশিদিনের নয়। কেননা প্রত্যয়গতভাবে বিমূর্ত চিত্রশিল্পের শু হয়েছিল ১৯১০ সালে, কান্‌দিন্‌স্কির হাতে, যে - শিল্পধারার একটি নিরঙ্কুশ পরিণতি আমরা দেখি ১৯১৭ সালে পিয়েৎ মন্‌দ্রিয়ানের কাজে।
ব্যক্তিমানসে বিমূর্ত শিল্পকলার ধারণা দেখা দিয়েছে, কিন্তু শিল্পকলাচর্চাই তখনো প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়নি, এই অবস্থায় বিমূর্তশিল্পধারার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয় আরো অনেক অনেকদিন। গগনেন্দ্রনাথের কাজেও বিমূর্ততা ছিল। ভাস্কর রামকিঙ্করের কাজে বিমূর্ততা ধরা পড়েছিল আরো উচচকিত স্বরে, দেশজ লয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল ক্যানভাস নয়, চিন্তা ও চেতনগত বিশ্লেষণেরমধ্য দিয়েও বৈধতা দিলেন বিমূর্তকে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু হয়ে উঠেছিলেন কালোত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান কিন্তু তারপরও তাঁরমধ্যে বিমূর্ত শিল্পচিন্তায় উদ্বেল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয় এই রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে নয়, শিক্ষাঅর্জনের লক্ষে কতিপয় তণশিল্পী দূর পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে যাওয়ার পরে। বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে তাই কানইদিন্‌স্কির ছায়া ফুটে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের আইডিয়াহীনতার স্বর লক্ষ করা যায় বিমূর্ত চিত্রকলা উদ্ভবের প্রায় অর্ধশতক পরে, ১৯৫৬ সালে হামিদুর রহমানের একটি প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। হামিদুররহমানের বিমূর্ত শিল্পপ্রদর্শনীর পর যে- প্রশ্ন উঠে আসে, যেসব আলোচনা হতে থাকে, তা বিমূর্ত শিল্পচর্চার ধারণা সম্পর্কেও সৃষ্টি করে বিভিন্ন বিভ্রান্তি এবং সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে এখনো আমরা এসে দাঁড়াতে পারিনি সেই বিভ্রান্তি বৃত্তের বাইরে। এইসব প্রশ্ন ও আলোচনার মূল স্বর ছিল এই যে, মূর্ত রেখা আঁকার অক্ষমতা ঢাকার জন্যে এইসব শিল্পীরা বিমূর্ততার ঢাল ব্যবহার করছেন।২
বিমূর্ত শিল্পকে অনুসন্ধানের বদলে প্রশ্নবিদ্ধ করার এই প্রবণতায় ধীরে ধীরে মূর্ত ও বিমূর্তের ধারণাগত পার্থক্য ও বিভ্রান্তি বাড়াতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নিরাময়ের অযোগ্য দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

।। দুই ।।

পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শিল্পীর সচেতন উপলব্ধি ও একাত্মতার দাবি এতই বেশি ছিল যে, বিমূর্ততাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করার, যুক্তি দিয়ে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায়নি। হামিদুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী, মর্তুজা বশীর কিংবা মোহম্মদ কিবরিয়ারা দেশের বাইরে গিয়েছিলেন, পশ্চিমা শিল্পভাবনা দিয়ে প্রভাবিত হয়ে এ-ধারার চর্চা করেছেন এবং বিমূর্ত শিল্প রাজনীতি ও সমাজবিমুখ হওয়ার সহজেই পণ্য হতে পারে, এরকম সব সরলীকৃত সমালোচনা আলোকে আমরা এই শিল্প থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছি। শিল্পের কোন বিভঙ্গ বিমূর্ততাকে আলাদা মাত্রায় উন্নীত করে, একসঙ্গে পথ চলতে চলতে কোনখানে গিয়ে মূর্ত থেকে বিমূর্তর পথ আলাদা হয়ে যায়, দার্শনিকতা আর সমাজিকতার সঙ্গে তার যোগসূত্র কোনখানে, সেই দর্শন ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত আমাদের দর্শন ও সমাজে যতটুকু শিকড় গেড়েছে -- ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা না করে সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই আমরা ব্যস্ত রয়েছি ছায়ার সঙ্গে তুমুল লড়াইয়ে।

'বিমূর্ত এই রাত্রি আমার, মৌনতার সুতোয় বোনা একটি রঙিন চাদর', সত্তরের দশকে কবি ফজল শাহাবুদ্দিনের লেখা জনপ্রিয় এই সংগীতটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কোন রূপকল্পের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করি? রাত্রি কি বিমূর্তই যদি হয়, তাহলে কবি কেন আবার এই পরেই ' মৌনতার সুতোয় বোনা একটি রঙিন চাদর' বলে সেই বিমূর্ততাকে খানিকটা মূর্ত করে তোলেন? কিংবা একবার মনে করি কালীকৃষ্ণ গুহের সেই কথাটি, বিমূর্ততার তিন উৎস -- আকাশ, ঈশ্বর আর শিল্প ; এইসব মিলেমিশে, আকাশ ঈশ্বর ও শিল্পকে গভীরভাবে খনন করতে করতে আমাদের চোখের সামনে বিমূর্ততার একটি দেশজ নন্দনতত্ত্ব গড়ে উঠতে পারে। কালীকৃষ্ণ গুহ বলেছিলেন, 'আকাশ নেই, ঈশ্বর নেই, শিল্পও জীবনের নির্মিত বা কাল্পনিক অবস্থান নিয়ে -- না - থাকা অবস্থান নিয়ে - গড়ে - ওঠা জিনিস। যে - শিল্প যা আছে তার বর্ণনামাত্র, তা শিল্প হিসেবে সার্থক হতে পারে না। প্রকৃতিতে যা আছে তার প্রতিফলনের পাশাপাশি শিল্পীকে জুড়ে দিতে হয় তাঁর আবেগ যা বিমূর্ততা তৈরি করে, শিল্পকে সার্থক করে। এই আবেগ অভিজ্ঞতা এবং প্রাকৃতিক রূপের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে, তাকে অপ্রাকৃত করে, রহস্যময় করে, ব্যাখ্যার অতীতে নিয়ে যায়।'৩

এইভাবে মূর্তের না- পাওয়াগুলো জোড়া দিতে দিতে, অপার পাওয়াগুলো উল্লাসে খণ্ডবিখণ্ড করতে করতে বিমূর্ততার আভাস গড়ে ওঠে এবং এর ফলে তার দার্শনিক ও সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অনেকটাই আড়ালে চলে যায়, ঢাকা পড়ে যায়।

কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেটি হয়, বিমূর্ততার নন্দনতত্ত্ব খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা না করে তার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটিই বড় করে দেখার চেষ্টা করি আমরা। বিমূর্ততা সম্পর্কে ভুল বোঝার কিংবা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ গড়ে ওঠে এই ধরনের অনুসন্ধানপ্রবণতার মধ্য দিয়ে। প্রাসঙ্গিকভাবেই মনে পড়ছে শিল্পী শোভন সোমের কিছু কথা। তাঁর মতে, 'বিষয়ধর্মী ছবিতে বিষয় আসে রূপক বা অ্যালিগরি হিসেবে, প্রতীক বা সিম্বল হিসেবে। বিষয় স্রষ্টার মনে ছবি প্রকাশ করে, কেবল বস্তুজগতের বর্ণনা দেয় না।'৪

তাঁর এই বক্তব্য থেকে বিন্তু আমাদের এই অনুসিদ্ধান্তে পৌছতে দেরি হয় না যে, এমনকি বিষয়ধর্মী কিংবা প্রতীকধর্মী ছবিও উত্তীর্ণ হতে পারে বিমূর্ততায়। আমরা দেখেছি, সৈয়দ আলী আহসান শিল্পীর লক্ষ্য হিসেবে বস্তুসত্তার উপকরণ বা বাস্তবতাকে নাচককরে দিয়েছিলেন, এর বদলে শিল্পীর লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন শিল্পীর শিল্পকর্মে প্রতিস্পন্দিত হওয়া বিশেষ অনুভূতিকে।'৫

এই বিশেষ অনুভূতিকে কিন্তু প্রতিস্পন্দিত হওয়ার জন্যে বিমূর্ততার পিঠেই সওয়ার হতে হয়। এমনকি রং নিজেই তো বিমূর্ততার পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে। রঙের উজ্জ্বলতা, আভা এবং ঘনত্বের বিচিত্র প্রকারভেদ অনেক সময়েই আবহ তৈরি করে বিমূর্ততার। পল সেঁজান দেখেছিলেন কোনো কোনো রং, যেমন লাল, সামনে চলে আসে, আবার কোনো কোনো রং মনে হয় সরে যাচ্ছে পেছনের দিকে, যেমন নীল রং। এর ফলে হয় কি, রং কেবল অনুভূতির প্রকাশ ঘটানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ছবিতে বর্ণনাতীত কিছু যোগও করে, যা বিমূর্ততার বোধের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এর ফলে ছবি সাবজেক্টিভ হওয়ার পরও আমরা আক্রান্ত হই বিমূর্ত রাত্রির মতোবিমূর্ততার বোধে। ভ্যানগাঁগের আত্মপ্রতিকৃতিতে সম্পূর্ণ নীলের

মধ্যে তাঁর তীব্র লালরঙা মুখটি ক্রমশ আমাদের চোখের সামনে চলে আসতে থাকে, কিন্তু বাকি অবয়র দূরে সরে যেতে থাকে। এই টানাপোড়েনের মধ্যে আমরা না দাঁড়াতে পারি কোনো সামাজিক ভূমিতে, না দাঁড়াতে পারি কোনো দর্শনক্ষেত্রে। রঙের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দিলে বা রঙের স্বভাব থেকেই বিমূর্ততার বোধ জন্ম নেওয়ার ধারণা মেনে নিলে ছবিতে রং ও শূন্যতার, আলো ও অন্ধকারের বিরোধাভাসের মধ্যে দিয়ে বিমূর্ততা আপনাআপনিই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েওঠে। তখন মধ্যযুগের ইউরোপের প্রতীকধর্মী শিল্পগুলোও বিমূর্ততাযুক্ত মনে হয় এবং শিল্পীর স্বভাব থাকুক বা না থাকুক, রঙের স্বভাবের কারণেই ক্যানভাসে আমরা নানা ইল্যুশন খুঁজে পাই।

দর্শনে বিমূর্ততাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে মূর্ততারই রূপভেদ কিংবা প্রতিপক্ষ হিসেবে। দার্শনিক হেগেলের সঙ্গে অবশ্য দার্শনিক মার্কসের বিমূর্তভাবনার পার্থক্য আছে। দার্শনিক হেগেল মনে করেন মূর্ত বিমূর্তের বিপরীত কোনো ভাব বা বস্তু নয়, বরং নিরন্তর বিকাশে মূর্তই প্রকাশিত হয় বিমূর্ত রূপে। তাই বিমূর্তও প্রকাশিত হতে পারে মূর্ত রূপে। বস্তুজগৎ সম্পর্কে হেগেলীয় ব্যাখ্যার বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা বিমূর্ততারও বিরোধিতা করি, যা অনেক ক্ষেত্রেই যৌক্তিক হয় না। হেগেল তাঁর বিমূর্ততাকে ব্যাখ্যা করেন একটি চরম অবস্থানে থেকে, যেখানে মূর্তকে মনে করা হয় বিমূর্তের আংশিক প্রকাশ।৬

সেদিক থেকে ইতিহাস, সমাজ কিংবা বস্তুজগৎ সবই হলো চরম বিমূর্তের মায়ারূপ প্রকাশ, কোনো কিছুই তাই চরম সত্য নয়। আমাদের এখানে বিমূর্ততা - বিরোধিতার উৎস অংশত এই হেগেলীয় ধারণা। কিন্তু বিমূর্তভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েও অন্নদাশঙ্কর রায় বিমূর্তের এই 'মায়া'রূপ প্রকাশের বিদ্ধে লিখে গেছেন। লেছেন, 'এই দৃশ্যমান জগৎকে মায়া বলে অগ্রাহ্য করে বা ছোট করে কোনোকিছুই সৃষ্টি করা যায় না। সে পন্থা আর্টের পন্থা নয়।'৭ কিন্তু বিমূর্তচিন্তার সঙ্গে হেগেলের বিমূর্তচিন্তাকে মিলিয়ে ফেলার আমরা ঢালাওভাবে এর বিরোধিতা করতে থাকি। ভুলে যাই হেগেলের এই বিমূর্ত চিত্রশিল্প গড়ে ওঠে বস্তুর প্রতিনিধিত্বগত উদ্দেশ্য ছাড়াই। মার্কসীয়ধারণায়, মূর্তের বিকাশ ও সামগ্রিকতায়ই যেহেতু মূর্ত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো বিমূর্তের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। মার্কসের এই কথাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করেও অনেকে বিমূর্ত শিল্পের বিরোধিতা করে থাকেন। তারা ভুলে যান, একজন মূর্ত শিল্পীই বিমূর্ত শিল্প সৃজন করছেন এবং একজন মূর্ত দর্শকই সেটা দেখছেন। বিমূর্তের রূপ ও রস অস্তিত্বময় অবিচ্ছিন্ন এক সত্তা হয়ে উঠছে তাদের মাধ্যমে। তফাৎ এই যে, হেগেলের মতো এই বিমূর্ততা কোনো মায়া নয়, অসত্য নয়, তাই অসুন্দরও নয়।

হেগেলীর দর্শনের বিমূর্ততার সঙ্গে শিল্পকলার বিমূর্ততাকে মিলিয়ে ফেলা আমাদের এখানকার এক বড় বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তির কারণে কোনো চিত্র বা ভাস্কর্যের মধ্যে স্পষ্ট দৃশ্যগতভাবে কোনো বস্তুর সমতা বা স্বাভাবিক গঠন নির্ণয় করতে না পারলেই তাকে আমরা বিমূর্ত শিল্প হওয়ার অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছি। কিন্তু জাদুবাস্তবতা প্রপঞ্চটি যেমন শিল্পকলা থেকে উঠে এসে সাহিত্যে ভিন্নার্থে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, বিমূর্ত প্রত্যয়টিও ঠিক তেমনি দর্শন থেকে উঠে এসে শিল্পকলায় যুক্ত হয়েছে ভিন্নমাত্রা নিয়ে। এই বিমূর্ত শিল্পের ঘাড়ে বস্তুর প্রতিনিধিত্বশীলতার দায় নেই যে তাকে হেগেলীয় ভাববাদী প্রবণতার উৎসারণ বলা যাবে। শিল্পের দৃশ্যগোচর উপকরণ হলো তার ফর্ম আর রং। বিমূর্ত চিত্রকর্ম এই উপকরণগুলোকে তাদের মৌলিক বস্তু থেকে পুরোপুরি মুক্ত করে। কিন্তু মূর্তকে বিমূর্তের আংশিক প্রকাশ হিসেবে প্রতিফলিত করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না এর পেছনে।

।। তিন ।।

ঔপনিবেশিকতার সূত্রে আমাদের শিল্পের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে। এই কেন্দ্রচ্যুতির আবহে একদিকে আমরা দেখি রাজা রবি বর্মার ইউরোপীয় রীতিতে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী বা বিষয়বস্তু বিবৃত করার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে দেখি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী পুনর্জ্জদীবনবাদমূলক ধারার চিত্রকলা। এই উভয় প্রচেষ্টাকেই শিল্পী আবুল মনসুর দেখেছেণ গতানুগতিক ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদের অ্যাকাডমিক ক্লিশে বা দিল্লি ও পাটনা স্কুলের স্থুলরীতির আলঙ্কারিকতা থেকে এক ধরনের মুক্তি হিসেবে।৮

এসবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প ও শিল্পচিন্তা প্রায় চাপা পড়ে যায়, আলোচনার ধারাবাহিকতায় অনুক্ত থাকে, যদিও এতদিন পরে আমরা দেখছি, তিনিই বাঙালি শিল্পীদের সামনে প্রথম বিমূর্ত শিল্পচর্চার উদাহরণ স্থাপন করেন এবং

সত্যিকার অর্থে লিখতে গেলে তাঁর এমন কোনো ছবি নেই যা বিমূর্তবোধকে তুলে ধরেনি।
জীবনস্মৃতিতে (১৩৫৭-১৮৮৫) কিংবা ছিন্নপত্রে (১৭ জুলাই ১৮৯৩) রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা ছবির প্রতি আকুতি দেখি।এর কয়েক বছর পরে দেখা যায় তিনি বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুকে চিঠি লিখছেন (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০০), ছবি আঁকতে শু করেছেন, প্যারিস সেলোন কিংবা কোনো দেশের ন্যাশনাল গ্যালারির জন্যে নয়। তাঁর ছবি আঁকার কারণ নিছকই 'কুৎসিত ছেলের প্রতি মার অপূর্ব স্নেহ থাকার মতো যে বিদ্যাটি ভাল আসে না সেটার ওপর অন্তরের টান থাকার' মতো। এবং এতে 'মৃত র‍্যাফেলের' (রাফায়েলের) 'যশের কোন লাঘব হবে না'। এর দীর্ঘ ২৭ বছর পরে ৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ -এ আমরা নির্মলকুমারী মহলানবিশের কাছে তাঁকে চিঠি লিখতে দেখি, ছবি আঁকা তাঁর একটি নতুন আবিষ্কার, তাতে নতুন করে উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছেন এবং 'নন্দলালদের প্রশংসা পেয়ে শ্রদ্ধা জমছে কাজটার ওপরে'। রবীন্দ্রনাথ যে বিমূর্তধারার যাত্রী হবেন সেটারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় নির্মলকুমারীর কাছে লেখা আরেক চিঠিতে, 'যখন আর কিছু ভালো লাগে না তখন ছবি আঁকি, কিন্তু আমার ছবি রেখার ছবি, রঙের ছবি; ভাবের ছবি নয়। ভাবের ছবির জন্যে কথা, সে ছবি অনেক এঁকেছি সম্প্রতি কথার চেয়ে রেখার পরে মনের টান হয়েছে বেশি। রেখা চোখের ভেতর দিয়ে মরমে পশে, কানের ভিতর দিয়ে নয়। কথাকে অর্থ দিতে হয়, রেখাকে দিতে হয় রূপ - রূপ বিনা অর্থেই ভোলায়। দৃশ্যমান হয়ে ওঠা ছাড়া ওর আর কোনো দায়িত্ব নেই।'৯
রবীন্দ্রনাথের বিমূর্তযাত্রা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে এরপর লেখা আরেক চিঠিতে (১৮ আগস্ট, ১৯৩০) 'আমার দেশের সঙ্গেআমার চিত্রভারতীর যোগ নেই বলে মনে হয়। কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো রঙ বলো কোনো বিশেষ দেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। ... আমি যে শতকরা এক শো হারে বাঙালী নই -- আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও এই কথাটিরই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।'১০
তারপর মস্কোতে নিজের প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩০) তিনি তাঁর দর্শকদের লক্ষ্য করে বলছেন, 'আপনাদের জন্যে আমার সহচেয়ে আন্তরিক উপহার হলো আমার চিত্রগুলো, এবং আমি আশা করি যে, কেবলমাত্র সেগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় হবে।'১১
মস্কোর এই প্রদর্শনীতেই সোভিয়েত সমালোচককে তিনি বলেন, তাঁর শিল্পের কোনো আইডিয়া নেই, ছবিতে কোনো আইডিয়া থাকতে পারে বলে তিনি মনে করেন না। সেখানে প্রদর্শিত একটি চিত্র দেখিয়ে সমালোচক জানতে চেয়েছিলেন, এটি দান্তের প্রতিকৃতি কিনা। রবীন্দ্রনাথ সে - প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, না, এটি দান্তের প্রতিকৃতি নয়। ছবিটি তিনি তার আগের বছর এঁকেছিলেন স্টিমারে বসে, তাঁর কলম তখন আপনগতিতে সৃষ্টি করে এই প্রতিকৃতি। যামিনী রায়ের কাছে লেখা চিঠিতে ছবি কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, ততই সে হয় একান্ত, ততই সে হয় বলো। তার ভালোমন্দের আর কোনো যাচাই হতে পারে না। আর যা কিছু -- সে অবান্তর -- অর্থাৎ যদি সে কোনো নৈতিক বাণী আনে, তা উপরি দান।'১২
কালীকৃষ্ণ গুহকেও আমরা দেখেছি, এই অস্তিত্বের অনুসন্ধান করতে, এই কথা লিখতে ভাবতে অবাক লাগে যে মানুষ বস্তুপৃথিবী বাইরে -- আকাশে ঈথরে শিল্পে - অর্থাৎ একটা শূন্যতায় মাথা ডুবিয়ে বাঁচতে চায়। তার বাঁচা শেষ পর্যন্ত বিমূর্ত, রহস্যময়, বিরহকাতর, ব্যাখ্যাতীত। অস্তিত্ব, অতিথি তুমি!'১৩
এই অস্তিত্বের অনুসন্ধান করতে করতেই তিনি দেখেছিলেন যে, সব শিল্পবস্তুই বিমূর্ততাকে উন্মোচিত করে, তিনি দেখেছিলেন, 'কৃষ্ণনগরের পুতুল শিল্প নয় যেহেতু তা বাস্তবের অনুকৃতিমাত্রা এক ধরনের বুদ্ধিনির্ভর কালিগরি কুশলতায় নির্মিত।' কিন্তু 'বাঁকুড়ার ঘোড়া শিল্পকর্ম, যেহেতু তার রূপের মধ্যে ঘোড়ার শক্তি গতি এবং রূপের ধারণা সঞ্চারিত হতে পেরেছে -- তাতে রয়েছে অতিগঠন ও ভাঙন, যা তাকে দিয়েছে এক ধরনের বিমূর্ত ধারণার অংশীদার হয়েছি আমরা অনেক আগেই।
তাহলে কেন এই বিমূর্ততার বোধে ছেদ ঘটলো? কেন তার পুনর্জ্জীবনের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হলো হামিদুর রহমান, মোহাম্মদ বিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, সৈয়দ জাহাঙ্গীর প্রমুখ অবধি? কেনইবা সেই বিমূর্তের সঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের বিমূর্তশিল্পগুলোর আইডিয়াবিনীনতা ছাড়া আর কোনো মিল খুঁজে পাই না? আর কেনইবা আমাদের

শিল্পবোদ্ধাদের সম্প্রতি দেখছি হাঁফ ছাড়তে, কেননা মুক্তিযুদ্ধের পর তাদের ধারণা - অনুযায়ী, বিমূর্ততার গণ্ডি থেকে আবার শিল্পকলার মুক্তি ঘটতে চলেছে? রাজনৈতিক ও সামাজিক তরঙ্গের বাইরে থেকে বিমূর্ত প্রত্যয়টির খোঁজ করলে এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না, বরং মূর্ত ও বিমূর্তের অহেতুক রূপভেদ তৈরি করা হবে। শিল্পকলা বিকাশের জন্যে আমাদের এগুতে হয়েছে বিদ্ধ স্রোতের মধ্য দিয়ে এবং বিকাশের এই আন্দোলন বিশেষত ১৯৪৭ - উত্তর পূর্ববাংলায় সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারায় মিলে গেছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনগুলোও শিল্পিত হয়ে ওঠার তাগিদে, সাংগঠনিক প্রয়োজনে, প্রচারণার আয়োজনে এসে দাঁড়িয়েছে শিল্পকলার প্রাঙ্গণে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন শিল্পকলাচর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্যে হেঁটেছেন বন্ধুর রাস্তায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, তিনি রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকারের নৈকট্যে ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ভিতে দাঁড়ানো একটি রাষ্ট্র যে শিল্পকলাচর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তুলতে পারে না, সেটাও তাঁর জানা ছিল। তখন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটছিল প্রধানত রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, কিন্তু তাতে প্রাণসঞ্চার করেছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ যত সংঘবদ্ধই হোক না কেন, সেই সংঘবদ্ধতার আকুতিও ছিল ব্যক্তির মুক্তি, ব্যক্তিপুঁজির বিকাশ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমুখী। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা ও ব্যাক্তিপুঁজির ধকল থেকেই নতুন করে উৎক্ষিপ্ত হয় আমাদের বিমূর্ত শিল্পের ভাবজমিন। ১৯৩০ -এর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম বিমূর্ততার একক উদ্ভাসন, কিন্তু অনুকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে ঘটে বিমূর্ততার সংঘবদ্ধ উদ্ভাসন। রবীন্দ্রনাথ তখন আর একা থাকেন না, বিমূর্ত শিল্পের প্রতি আগ্রহী একঝাঁক টগবগে তাজা তণ শিল্পীর মধ্যে দিয়ে আবারো জেগে ওঠে বিমূর্ত শিল্প। কিন্তু বিমূর্ত শিল্প জেগে উঠলে ইতিহাসের ধারা রবীন্দ্রনাথকে যুক্ত করতে পারেনি বিমূর্ত ভাবনায় অনুপ্রাণিত নতুন প্রজন্মের বাঙালি শিল্পীদের সঙ্গে। এটি খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তখন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেও এবং রবীন্দ্রসংগীতের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বিদ্ধে সংগ্রামমুখর হলেও রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত শিল্পচিন্তার সন্ধান করেনি।
কেন এরকম হয়েছিল? পুরো পাকিস্তানের শিল্পকলা আন্দোলন তো তখন আবর্তিত হচ্ছিল মূলত ঢাকা কেন্দ্র করেই আর এ-কারণেই ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে শুধু ১৯৬১ সাল বাদে প্রতি বছরের জাতীয় পুরস্কারই অর্জন করে নেয় পূর্ববাংলার চিত্রশিল্পীরা। দুটো ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন। একদিকে ছিল পূর্বসূত্রে পাওয়া লোকঐতিহ্য অনুপ্রাণিত ধারা যাকে মোটা দাগে শিল্পসমালোচকরা বলে থাকেন মূর্তশিল্পের ধারা, অন্যদিকে নতুন রূপে একেবারেই নতুন আঙ্গিকে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে হারিয়ে যাওয়া বিমূর্ত শিল্পধারা। বস্তুত শিল্পআন্দোলনের এই বিন্যাস ছিল পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, শ্রেণিকাঠামো আরবিকাশমান বিবিধ শ্রেণিচেতনারই এক ভিন্নমাত্রিক বহিঃপ্রকাশ। গ্রাম থেকে উঠে আসছিল কৃষকদের সন্তানেরা, যারা শিক্ষিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যবিত্ত মানসের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিল এবং চেষ্টা চালাচ্ছিল ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে না হলেও চিন্তাচেতনায় বিকাশিত ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের সংখ্যা ও পরিধির বিস্তার ঘটানোর। ষাটের দশকে বিশ্বব্যাপী সংগঠিত তীব্র ছাত্রআন্দোলন বিভিন্ন আন্তর্জতিক কাঠামো, ধারা ও প্রবণতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাদের। এইসব আন্দোলন মধ্যবিত্ত মানসে লোক ঐতিহ্যের পাশাপাশি যুক্তকরে মুক্তির আকাঙ্খায় শাণিত সমাজবাদের চেতনা, অন্যদিকে জন্ম দেয় পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের। রাষ্ট্র রবীন্দ্রনাথের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মধ্য দিয়ে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে বাঙালি মধ্যবিত্ত অনুভব করে অস্তিত্বের সংকট। সেই অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে তাঁরা যে - রবীন্দ্রনাথকে তুলে আনেন সে - রবীন্দ্রনাথে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যজ্ঞে ঢাকা পড়ে যায় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ, বিমূর্ত রবীন্দ্রনাথ।
যে - কোনো কারণেই হোক, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনও মুক্ত হতে পারেননি বিমূর্ত শিল্পধারা থেকে। তিনিও এক পর্যায়ে নির্বস্তিক ছবির তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন, নির্বস্তক ছবিও আঁকেন। যদিও 'অবয়বহীন চিত্রের বৌদ্ধিক বিস্তার ও তার বিমূর্ত ভাবনার প্রয়োজনীয়তা'কে তেমন কোনো গুত্ব পায়ইনি জয়নুলের কাছে।১৪
ইউরোপীয় অ্যাকাডেমিক রীতির ছাত্র জয়নুলকে সমকালীন ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রধান প্রবণতাগুলো কখনো কখনো উন্মুখ করলেও প্রভাবিত কিংবা আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তবে জয়নুলের আঁকা নির্বস্তুক ছবি তখনকার বিমূর্ত শিল্পের ধারায় নীরবে হলেও ছাপ ফেলেছিল। নির্বস্তুক এই জয়নুল আবিস্কৃত হচ্ছেন নতুন করে। অন্যদিকে কামল হাসান তাঁর অননুকরণীয় শৈলীতে লোকজধারার কাজ করলেও অনেক সময় ব্যয় করেছেন নৈর্বস্তুকতার রূপাভাস গড়ে তোলার ক

াজে।১৫

তিনি তাঁর ছবিতে মানবমূর্তি চিত্রণে বাংলার লোকশিল্পের অন্যতম প্রধান উপাদান কাঠের পুতুলকে দাঁড় করান শিল্পতাত্ত্বিক প্রয়োজনে মোচড় দিয়ে। এর ফলে আমরা দেখি তাঁর কাজের ধারার সঙ্গে অ্যানালিটিক্যাল কিউবিজমের খানিকটা অন্বয়।১৬

সফিউদ্দিন আহমদ, যিনি বাংলাদেশে আসার আগেই ভারতের শিল্পবোদ্ধাদের কাছ থেকে মর্যাদা আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনিও 'বস্তুক চিত্র থেকে ক্রমশ নির্বস্তুক চিত্রের দিকে যাত্রা করেছেন।'১৭

পূর্ববাংলায় প্রথম প্রজন্মের এই শিল্পীদের মধ্যকার বিমূর্ত শিল্পের সুপ্ত, সংগোপন বোধের পাশাপাশি ছিল হামিদুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী, মোহাম্মদ কিবরিয়া, মর্তুজা বশীর, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, আবদুল বাসেত প্রমুখের বিমূর্তবোদের উচচকিতপ্রকাশ। দেশের বাইরে লেখাপড়া করতে গিয়ে তাঁদের অনেকের কাজের ধারায়ই বড় ধরনের পরিবর্তন আসে এবং বিমূর্ত শিল্পসৃজনে তাঁরা অদম্য হয়ে ওঠেন। কিন্তু এও অনস্বীকার্য, এখানকার শিল্পদর্শকদের মধ্যেও তখন বিমূর্ত শিল্প অবলোকনের মেজাজ গড়ে উঠেছিল,অবলোকনের সামাজিক বোধও তৈরি হয়েছিল এবং এর ফলে বিমূর্ত শিল্পই তখন হয়ে ওঠে আমাদের শিল্পচর্চার প্রধান ধারা। পণ্যমানএবং বাজারপ্রবণতাও এতে ভূমিকা রেখেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল বাজারচাহিদাই নম্র ও স্নিগ্ধ বিমূর্তশিল্পকে শিল্পচর্চার ধান ধারা করে তোলেনি। লক্ষণীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজবাদী আন্দোলনের ধারা প্রবল হওয়ায় বিমূর্ত শিল্পধারার শিল্পীরাও নিজেদের সম্মিলিত বিকাশের জন্যে তাতে যুক্ত হয়ে পড়েন। রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মজ অপশক্তিকে তখন পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছিল এবং তা ব্যাহত করছিল শিল্পচর্চার ধারাকে। তাই বিমূর্ত ধারার শিল্পীরাও তখন সমর্থন জুগিয়েছেণ সমাজবাদী রাজ - সাংস্কৃতিক ধারাকে।

শিল্পীদের বিমূর্তচিন্তার দুয়ার খুলে দেন দীর্ঘদিন আমেরিকা ও ইউরোপের দেশে দেশে শিক্ষা নিয়ে, পরিভ্রমণ করে স্বদেশে ফেরা হামিদুর রহমান। ১৯৫৬ সালে ঢাকায় তাঁর প্রথম প্রদর্শনীতে তিনি বলতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটান ক্যানভাসে বালি আর কাঠের গুঁড়ো ছিটিয়ে ভিন্নমাত্রার এক নন্দনতাত্ত্বিকতা সৃজন করে। এমনকি সুপ্ত, সংগোপন বিমূর্ততার বোধে আক্রান্ত শিল্পী ও দর্শকরাও বোধকরি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না এসবের জন্যে। মানুষের বাহ্যিক অবয়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মানসজগৎকে রঙে ও রেখায় তরঙ্গায়িত করার নতুন প্রবণতা দেখিয়ে হামিদুর রহমান অনায়াসে বিদ্রোহী পথিকৃৎ হয়ে ওঠেন। 'বিশ্রামরত নৌকা' নামের চিত্রটির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বিমূর্ত শিল্পভাবনার চূড়ান্ত রূপ মূর্ত করে তুলেছেন।

কালক্রমে এইসব শিল্পীর মধ্যে মোহাম্মদ কিবরিয়া হয়ে ওঠেন অপ্রতিহত। কিবরিয়া মার্কিন চিত্রশিল্পী মার্ক রথকো ও সুইস চিত্রশিল্পী মার্ক্স বলিরে মতো একই - রঙে রঙের সঞ্চরণশীল সৃষ্টিমূলক কাজ করেও শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পেরেছেন রথকো ও বিলের অনুকৃতি থেকে। রঙের টোনাল পার্থক্য, আঁচড় ও টেক্সচার দিয়ে তিনি যে পরিমিতিবোধ ও প্রাচ্যরীতি মৌল উপাদান ছন্দ্র তৈরি করেন তাতে আমরা চকিতে জয়নুলকেও আবিষ্কার করি, আবার হারিয়ে ফেলি, আবারো খুঁজে পাই হঠাৎ করে। শু থেকেই তিনিবিমূর্ততার বোধ বয়ে চলেছিলেন। মানুষের মনোজাগতিক ধূসরতা, হতাশা আর নিদ্যমতাই যেন তাঁকে আকৃষ্ট করেছে এবং তিনি তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আরো বেশি রঞ্জিত করে। এই অতিরঞ্জনের আকাঙক্ষাতে শিল্পচর্চার শু দিকেই তাঁর ক্যানভাস থেকে মানুষের অবয়ব ক্রমশ উধাও হয়ে যায় এবং জ্যামিতিক আকৃতি পায়। 'ত্রিমূর্তি' চিত্রটি তাঁর এই পর্বের একটি সার্থক কাজ। বিমূর্ত শিল্পধারার আরেক শিল্পী আবদুল বাসেতকে আমরা দেখি জ্যামিতিকতা, ভাস্কর্যমূলকতা ও গীতল আবহে বিমূর্ত ছবি আঁকতে। কখনো আবার পুরো বিমূর্ত ছবির মধ্যে প্রতিস্থাপন করেন আধাবিমূর্ত ছবি। তবে রং - ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো বিরোধাভাস না থাকায় তার চিত্রে বিমূর্ততা ছাপিয়ে স্নিগ্ধতা উপচে পড়ে।

এ - সময় বাংলাদেশের ভাস্কর্যশিল্পের পথিকৎ নভেরা আহমদের ভাস্কর্যে শু থেকেই দেখা যায় পরিমিত বিমূর্ততার বোধ। হেনরি মুর ও বারবারা হেপওয়ার্থে ছায়া থাকার পরও ভাস্কর্যে তিনি নিজস্ব ছায়া থাকার পরও ভাস্কর্যে তিনি নিজস্ব ভাষা ও বিমূর্ততারচেতনা নির্মাণ করতে পেরেছিলেন, মৌলিকত্বের রূপভাষা সৃজন করেছিলেন। যদিও তা কোনো পরিণত রূপ পায়নি নভেম্বর এ-দেশ ও শিল্পচর্চা থেকে তিনি ক্রমশ দেশজচেতনার প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ান, কিন্তু বিমূর্তচেতনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। অনেক কাজই তিনি করেন কাংড়া ও বাংশোলী রীতিকে ভেঙে গোয়াশ করে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের আগে থেকেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পূর্ববাংলায় চিত্রপ্রদর্শনী কমতে শু করে। শিল্পীরা শু থেকেই রাজনৈতিক কার্যত্রমে যুত্ত ছিলেন, এসময় তাঁদের ভূমিকা আরো প্রত্যক্ষ ও সার্বক্ষণিক হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের মতোতৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের জাতীয় মুত্তি আন্দোলন ও মুত্তিযুদ্ধে যা ছিল খুবই স্বাভাবিক। ষাটের দশকের এসব আন্দোলন বিমূর্ত শিল্পীদেরও প্রভাবিত করেছিল প্রচণ্ডভাবে, যার চিহ্ ধরে রেখেছে শিল্পী মর্তুজা বশীরের বিতর্কিত বিমূর্ত চিত্রসিরিজ 'দেয়াল'। সামরিক জান্তা আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের আবহে 'দেয়াল' তার বিমূর্ততার মধ্যে এক দ্ধ দমবন্ধ করা পরিবেশকে মূর্ত করে তোলে।

।। চার ।।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিমূর্ত শিল্প যে - ঝড় তুলেছিল, বাংলাদেশে তা স্থায়ী প্রবণতা হয়ে ওঠেনি বলে অনেকেই মনে করেন। এ - ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে ক্যানভাসে ফিগার ফিরে আসার প্রবণতা লক্ষ করে, চিত্রকলায় দেশীয় ইতিহাস - মিথ - আখ্যান ইত্যাদির ব্যবহারে আগ্রহ দেখে, নেরেটিভ উপাদানের চল ঘটাতে। তবে সমাজ ও জীবনের নানা অসংগতি চিত্রকলায় অধুনা অনেক বেশি উচচকিত হলেও তা বিমূর্ততাকে কতটুকু খর্ব করতে পেরেছে, তা নিঃসন্দেহে তলিয়ে দেখার বিষয়। মুত্তিযুদ্ধের পরপরই দীর্ঘ সামরিক ও স্বৈরশাসন বাংলাদেশের স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ব্যাহত করে। ব্যত্তিমানুষের যন্ত্রণা ও ব্যত্তিস্বাতন্ত্র্যতার আকাঙক্ষা সংগতকারণেই আরো প্রলম্বিত হতে থাকে। অন্যদিকে ব্যত্তিকবোধ থাকলেও মানুষ সামরিক শাসনবিরোধী রাজনৈতিক প্রয়োজনে ঐক্যের বোধেও সংঘবদ্ধ হয়। এর মধ্যে মৌলবাদী চেতনা ও রাজনৈতিক শত্তিরও প্রসার ঘটে, শিল্পীদের জন্যে নতুন শঙ্কার জায়গা তৈরি হয়।বিমূর্ত শিল্পীদের জন্যে বর্তমান পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ এ - কারণে যে, কোনো কোনো শিল্পী বিমূর্ত ধারাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র - ধর্মজচেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে প্রচার চালাচ্ছেন। এই অপপ্রচারের মধ্য দিয়ে শিল্পকলার ক্ষেত্রে আগ্রাসন চালানোর একটি ভাবভূমি তৈরির প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এসবের ফলে বিমূর্ত শিল্পবহির্ভূত স্রোত শত্তিশালী হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিসার হোসেন, শিশির ভট্টাচার্য্য, দিলারা বেগম জলি, নাজলি নায়লা মনসুর ও ঢালি আল মামুনদের মতো সামাজবাদী স্রোতের শিল্পযাত্রী থাকার পরও একথা বলা ঠিক হবে না যে, বিমূর্ত শিল্পের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত লেখা যায়, নিসার হোসেনেরশিল্পচর্চা সমাজবাস্তবতার সঙ্গে মিশে থাকলেও ক্যানভাসের জমিনে তিনি পুরোপুরি বিমূর্ত মানসিকতার। ফিগারের পাশাপাশি তিনি এমন অনেক রং ও রেখা ব্যবহার করেন, যেসবের তাৎপর্য ছবির ফর্মকে বিমূর্ত করে ফেলে। ঢালি আর মামুন তাঁর ফিগারে যে - রেখা আঁকেন,তা মনে হয় না পরিকল্পিত কিংবা উদ্দেশ্যপ্রবণ, এই রেখার চরিত্র পুরোপুরি সীমারেখাহীন। বিমূর্ত শিল্পের জনক কান্‌দিন্‌স্কি তাঁর রেখার চরিত্র সম্পর্কে বলেছিনেল যে, ***

রেখার কোনো সীমারেখা নেই, উৎস কিংবা গন্তব্য নেই; ঢালির ক্যানভাসের রেখা কিন্তু আমাদের সেই বোধই জাগিয়ে তোলে। তাছাড়া ঢালি আল মামুন তাঁর স্থাপনাশিল্পসমূহে যে প্রতীক ব্যবহার করেন তা প্রতীকী আমেজ ছাপিয়ে ত্রোধ, হতাশা, হাসি, কান্না অতিত্রম করে উন্নীত হয় বিমূর্ততায়।

আসলে শিল্পের ভাষা আন্তর্জাতিক হওয়ায় এর আন্তর্জাতিক গতিপ্রবণতা থেকে বাংলাদেশের শিল্পীরাও মুত্ত থাকতে পারেননি। সব মিলিয়ে বিমূর্তচেতনাকে খর্ব করে আমাদের দেশের শিল্পীদের মধ্যেও ফিরে আসছে আধাবিমূর্ততা, অবয়বমুখী অনুভূতি। এই প্রবণতার উৎস কেবল মুত্তিযুদ্ধোত্তর সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতাই নয়। এখন ইউরোপ আর আমেরিকাতেও বিমূর্ত শিল্পকলাকে সার্বজনীনধারা হিসেবে দেখা হয় না। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরীক্ষা - নিরীক্ষায় মগ্ন শিল্পীদের কারণে বিমূর্ত শিল্প তার সার্বজনীনতা হারায় এবং সে - জায়গার অনেকটাই দখল করে নেয় বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সাইকিডেল আর্ট, পপ ও অপ আর্ট। অথচ বাংলাদেশের বিমূর্ত শিল্পকলা একটি অভিনব, আলোচিত ও পরিণত মাত্রা পায় এরকম সময়ে। বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে ইউরোপে শু হয় বিভিন্ন ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে শিল্পনিরীক্ষা, দেখা দেয় বিভিন্ন স্থাপনামূলক আদল, পারফমিং আর্ট এবং দৃশ্যশিল্পকে প্রায়োগিক কৌশল ও দক্ষতা দিয়ে এক করে ফেলা হয়। অন্যদিকে সারাবিশ্ব গ্রন্থিত হয় বিশ্বায়নের জালে। সেই জাল অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে - পড়া দেশগুলোর মেদণ্ড ভেঙে ফেলার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে, অন্যদিকে স্থানিক পর্যায়ের যাবতীয় শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের

চিড়িয়াখানায়‘আজব জীব’ হিসেবে জমা করার জন্যে মেদণ্ড ভাঙা কিংবা মেদণ্ডহীন পিঠে হাত বুলাতে থাকে কী বাঙালি, কী আদিবাসী, কী উপজাতি, কী অন্যবর্ণা মানুষ --সবাই হয়ে পড়ে ঋায়নের চিড়িয়াখানার জীব। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তির অঋাস্য উন্নয়নঅনায়াসে মেলবন্ধন গড়ে তোলে এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের। এতে করে বিদেশপ্রভাবিত শিল্পধারা দিয়ে নিজের দেশের শিল্প ও শিল্পবাজারকে মোহমুগ্ধ করার সুযোগ সংকুচিত হয়, তার বদলে লোকজ ঐতিহ্য প্রদর্শন করে বিশ্বের শিল্পবোদ্ধা ও শিল্পবাজারকে বিমুগ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ঋায়নের এরকম পর্য়প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের চিত্রকলায় নতুন ধাঁচে উন্মোচিত হয় সামাজিক ও জাতীয় বাস্তবতার বোধ। পূর্ববাংলার পরিপ্রেক্ষিতে ষাটের দশকে আন্তর্জাতিকতাবাদে ও ঋায়নপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তাতে শিল্পকলার খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে দেশজঘ্রাণ ও লোকজ ঐতিহ্য। বিমূর্ত ধারার শিল্পী হওয়ার পরও মকবুল ফিদা হুসাইন তাই আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত হচ্ছেন, কেননা, তিনি তাঁর বিমূর্ততার শিল্পে ভারতীয় শিল্পের রেখাপ্রতিমা জুড়ে দিতে পারছেন। দেশজ স্বরে কাজ করার পরেও তাই স্পেনের মূলধারার শিল্পী হয়ে উঠছেন বাংলাদেশের মনিল ইসলাম। এর ফলে লোক ঐতিহ্যের ধারাও নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। ভারতের শান্তিনিকেতন ও বরোদা থেকে উচচশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে যারা ফিরছেন তারাও এখানে একধরণের স্কুলিংয়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন, যারসঙ্গে ঘাটের দশকের বিমূর্ততার বেশ খানিকটা দূরত্ব লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে জাপানের চিত্রকলার সঙ্গে নিবিড়তর যোগাযোগ এখানকার স্থাপনাশিল্পকে গতিময় করে তুলেছে। ইউরোপ কিংবা আমেরিকায়ও বাংলাদেশের অনেক শিল্পী হয়েছেন, তাঁরা মাঝে মধ্যেই বাংলাদেশে ফিরে আসছেন, প্রাদর্শনী করছেন এবং আন্তর্জাতিক শিল্পের বিকাশ পরখ করা যাচেছ অনায়াসে ঘরে বসেই বিভিন্ন ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের সহায়তায়।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা খুঁজে পাই বয়সে প্রবীন, কিন্তু বিমূর্ততায় নবীন মনিল ইসলামে, যিনি দীর্ঘদিন ধরেই অভিবাসী। ঋায়িত পৃথিবীর বিমূর্ত শিল্পতাগিদকে তিনি পূরণ করেন সফলভাবে। আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত তাঁর বিভিন্ন বিমূর্ত চিত্রকলায় আমরা খুঁজে পাই দেশজ ও লোকজ অনুভূতি, রেখা এবং জমিন। মোহাম্মদ কিবরিয়াকেও আমরা দেখি নির্বস্তুক থাকলেও ক্যানভাসের রংকে অনেক বেশি অনুভূতিপ্রবণ করে তুলতে, বিষয়ের আবহকে অনেক বেশি উদ্বেল করে তুলতে। শূন্য দশকে তিনি তাঁর সর্বশেষ প্রদর্শনীতে কোনো কোনো ক্যানভাসে ব্যবহার করেন সুররিয়ালিস্টিক আমেজ ও অনুভূতি, জাগিয়ে তোলেন এমন এক তাণ্য মৃত্যুলীন বেদনাকেও, যা মনে হয় খুবই আপন।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের বিমূর্ত শিল্পধারায় সংযোজিত হয়েছেন মাহমুদুল হক, রোকেয়া সুলতানা, ওয়াকিলুর রহমান, জি এস কবির, মোহাম্মদ ফখল ইসলাম, রশিদ আমিন, গৌতম চক্রবর্তী সামছুল আলম আজাদ, নাসিমা হক মিতু, ময়নুল ইসলাম, রশিদ আমিন, গৌতম চক্রবর্তী, সামছুল আলম আজাদ, নাসিমা হক মিতু, ময়নুল ইসলাম পল, আবদুর রতহমান, বিপুল শাহ প্রমুখ। এঁদের কারো কারো কাজে আমরা ফিরে পাই রবীন্দ্রনাথের বিমূর্তচেতনা, যা মোহাম্মদ কিবরিয়াদের পশ্চিমপ্রাণিত বিমূর্ত ধারা থেকে বেশ আলাদা। মাহমুদুল হকের সবুজ রঙে আচছন্ন ক্যানভাসে বিমূর্ততার মধ্যে প্রকারান্তরে এদেশের প্রকৃতিই উচচকিত, উন্মোচিত এদেশের মানুষের হৃদয়ের সবুজ দুয়ার। রোকেয়া সুলতানা এত স্বচছন্দে তাঁর রেখা ও রংকে করে ফেলেন যে, ফিগারগুলো খুব সহজেই বিমূর্ততা পায়। ওয়াকিলুর রহমান তাঁর বর্ণনাধর্মী কাজের ক্ষেত্রে রঙের যে - অবতল তৈরি করেন, সেই অবতল ফুঁড়ে একই রং স্পন্দিত হয় পুনরায় অথবা একই ইমেজ পরিবর্তনের স্রোতে আবর্তিত হয় অন্য রঙে এবং তা আমাদের মধ্যে বিমূর্ততার বোধ জাগিয়ে তোলে। তাঁর সর্বশেষ প্রদর্শনীতে তিনি চেয়েছেন দৃশ্য ও শূন্যতাকে শব্দিত করে তুলতে, যা থেকে উদ্বোধন ঘটে ঘটমান বিমূর্ততার। মোহাম্মদ ফখল ইসলামের ইমেজভিত্তিক কিংবা গৌতম চক্রবর্তীর সাবজেক্টভিত্তিক দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্মগুলো পরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত; বিশেষত ফখল আচছন্ন শূন্যতার মধ্যে এমনভাবে তার বিন্দুগুলোকে ব্যবহার করেন যে, আমরা বিন্দুর মধ্যে দিয়েই অর্জন করি সিন্ধুর অনুভূতি।অন্যদিকে রশিদ আমিন, সামছুল আলম আজাদের চিত্রকলায় কিংবা নিসিমা হক মিতু ও ময়নুল ইসলাম পলের ভাস্কর্যে রবীন্দ্রিক বিমূর্তচেতনার আভাস বেশ সুস্পষ্ট। রশিদ আমিন তাঁর সর্বশেষ জলরঙা চিত্রের প্রদর্শনীতে এমনসব চিত্র উপস্থাপন করেন, যা বিমূর্ত হলেও দর্শনগতভাবে মুখর, রং ও রেখাকে তিনি মুক্ত করে দিয়েছেন তুলির মুখে, খেলা করেছেন আপনমনে কোনো অন্বিষ্টের সন্ধান না করে। সামসুল আলম আজাদ তাঁর সর্বশেষ প্রদর্শনী ‘প্রকৃতির মনে’ রং ও তুলি নিয়ে যাত্রা শু করেন এবং তাদের ওপরেই ন্যস্ত করেন গন্তব্য। এঁদের কাজ বিমূর্ততাকে মেহাম্মদ কিবরিয়াদের ধারা থেকে সরিয়ে আনছে। তাঁরা এমনসব বিষয়, উপকরণ ও ভাবনাতে আকীর্ণ যা পরিভ্রমণ করে দেশজ

লোকজ ঐতিহ্যর মধ্যে। কিন্তু সেই ঐতিহ্যকে তাঁরা বিমূর্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁদের ফর্ম ও রংকে মুক্তভাবে বিচরণ করতে দিয়ে। তাঁদের ক্যানভাসের এই রেখা ও বিমূর্ততা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের বিমূর্তচিন্তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। নাসিমা হক মিতু ও ময়নুল ইসলাম পল তাঁদের ভাস্কর্যকে মুক্ত করেছেন নিছক জ্যামিতিক আদল থেকে। যুক্ত করেছেন লোকজ আকৃতির সঙ্গে, রয়েছে জড়বস্তুকে তার মূল আকৃতি থেকে ভিন্ন কোনো আদল দিয়ে অনির্দিষ্ট এক ব্যঞ্জনা তৈরি করার তাগিদ।

এইভাবে, বোধকরি, বাংলাদেশের বিমূর্ত চিত্রকলা নতুন এক গন্তব্য খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর এই তাগিদে সৃষ্টি হয়েছে একদিকে লোকজ ঐতিহ্য প্রকাশের প্রথানুগত ধারা থেকে দূরে থাকার আকাঙ্ক্ষা থেকে, অন্যদিকে ভূমি থেকে দূরবর্তী বিমূর্তধারা থেকে মুক্ত হওয়ার অন্তর্গত বাসনা থেকে। এবং এসব তাগিদকে আরো উসকে দিচ্ছে বিশ্বায়নের ধারা। বিশ্বায়ন প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। বিমূর্তযাত্রী হওয়ার পরও তাই বাংলাদেশের শিল্পীরা অনেক বেশি নিকটবর্তী হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্র-বিমূর্তভাবনার। কিন্তু এই বিমূর্ত শিল্পধারার পথ এখন ষাটের দশকের চেয়ে অনেক বেশি বন্দুর, কেননা তার সমস্ত কৃতিত্ব যে - কোনো মুহূর্তে মৌলবাদী অপশক্তি গ্রাস করতেপারে, বিমূর্ত শিল্পের অন্যসব মাধ্যমকে, বিশেষ। ভাস্কর্য ও অবয়ব - সৃজন দ্ধ করার কাজে এবং অবয়ব - সৃজনের বিরোধিতা কাজে।

সত্তরের দশকের শেষের দিকে শিল্পী বুলবন ওসমান লিখেছিলেন 'বাংলাদেশ তার চিত্রকলায় বিশ্বের সর্বশেষ আঙ্গিক গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিশ্বকে দেবার মতো তার নিজস্বতা সম্বন্ধে জানতে হলে, দেখতে হবে বাংলার নিজস্ব যে ঐতিহ্য ছিল তাকে কেউ আজকের বিংশ শতাব্দীতে টেনে আনতে পেরেছে কিনা, --- সেটাই হবে বাংলাদেশের নিজস্ব অবদান।'১৮

এই প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ দিয়েছিলেন অরসকো, রিভেরা, সিকুয়াইরস ও তামায়োর, যাঁরা মেক্সিকোর বিপ্লবের পর সেখানকার প্রাচীন শিল্পকে নিয়ে নতুন করে উপস্থিত হয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর অঙ্গনে। ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি এর সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন মুগলদের শেষ আমলে কাংড়া, কাশোলি ও অন্যান্য পাহাড়ি ঘরানাগুলোর মধ্যে যারা ঠিক মুঘল চিত্রের কপি করেনি, বরং তৎকালীন যুগের আধুনিক শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। শিল্পী আবুল মনসুর সঙ্গত লিখেছিলেন, 'বর্তমানের শিল্প আমাদের কাছে যত অগ্রহণযোগ্য ও দুর্বোধ্য হোক না কেন পিছু হাঁটার রাস্তা আর নেই, প্রচলিত চির নামে একশো বছর পিছু হটা হবে আত্মহত্যার নামান্তর।'১৯

এই দুই সত্যই আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

এই দুই সত্যের নিরিখে আমাদের আরো কয়েকটি প্রশ্নর উত্তর খুজে পাওয়াও খুবই জরি। নতুন প্রজন্মের সৃষ্টিশীলতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিমূর্ত চেতনামুখী হওয়ায় আমরা কি উল্লসিত হবো? নাকি যে পশ্চিমা বিমূর্ততা আমাদের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছিল, তা আমাদের পারিপার্শ্বিকতা থেকে হারিয়ে যেতে শু করায় বেদনার্ত হবো? রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত শিল্পচিন্তা ফিরে আসার পরও কি প্রচল মূর্ত শিল্পের সঙ্গে বিমূর্ত শিল্পের বিরোধিতাগুলো আগের মতোই জ্বলজ্বল করবে? মৌলবাদীরা যদি বিমূর্ত শিল্পকেঅবলম্বন করে আমাদের শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের সৃজনশীলতা খর্ব করতে চায়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত শিল্পচিন্তাকে অবলম্বন করেআমরা কি পারব ষাটের দশকের মতো সংঘবদ্ধ হতে ?

তথ্যসূত্র ঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সংকলন ও ভূমিকা শোভন সোম), 'আমার ছবি', সাপ্তাহিক দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, কলকাতা, ১৩৯৯ পৃষ্ঠা ১২।

২. সাঈদ আহমদ বাংলাদেশের চিত্রকলা, ষান্মাসিক শিল্পকলা, ঢাকা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শীত ১৩৮৪, পৃষ্ঠা ৯০-৯১।

৩. কালীকৃষ্ণ গুহ 'অস্তিত্ব, অতিথি তুমি', যোগসূত্র, পৃষ্ঠা ১৩৯।

৪. শোভন সোম 'সফিউদ্দিন আহমেদের চিত্রকলা', নিরন্তর, ঢাকা, পঞ্চম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪০৬, পৃষ্ঠা ৬২।

৫. সৈয়দ আলী আহসান ভূমিকা, শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য, বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমী - সংস্করণ, ঢাকা, আষাঢ় ১৪১১, পৃষ্ঠা ২।

৬. সরদার ফজলুল করিম দর্শনকোষ, প্যাপিরাস সংস্করণ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

৭. অন্নদাশংকর রায় আর্ট, মায়া ও সত্য, পুনশ্চসংস্করণ গ্রন্থমেলা কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৮৫।
৮. আবুল মনসুর স্বাধীনতার ২৫ বছর ও বাংলাদেশের চিত্র - ভাস্কর্য প্রেক্ষাপট ও পরিপ্রেক্ষিত, ষান্মাসিক শিল্পকলা, অষ্টাদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৪০৪/ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১২।
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ, পৃষ্ঠা ৮।
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ, পৃষ্ঠা ১১-১২।
১১. রবীন্দ্রনাঠ ঠাকুর ঐ, পষ্ঠা ১২।
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ, পৃষ্ঠা ১৮।
১৩. কালীকৃষ্ণ গুহ ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৯।
১৪. সৈয়দ অনজুল ইসলাম জয়নুল আবেদিন ও শিল্পচর্চার পঞ্চাশ বছর, ষান্মাসিক শিল্পকলা, উনবিংশ বর্ষ ২য় ও বিংশবর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮।
১৫. সৈয়দ মনজুল ইসলাম ঐ , পৃষ্ঠা ৮।
১৬. বুলবন ওসমান বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের উন্নয়ন সামাজিক পটপ্রেক্ষিত, ষান্মাসিক শিল্পকলা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শীত ১৩৮৪, পৃষ্ঠা ১৮।
১৭. বুলবন ওসমান ঐ, পৃষ্ঠা ১৭।
১৮. বুলবন ওসমান ঐ পৃষ্ঠা ২৩-২৪।
১৯. আবুল মনসুর শিল্পী, দর্শক, সমালোচক, আধুনিক শিল্পের গতিপ্রকৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৩৯৩, পৃষ্ঠা ১৬।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com